নিসর্গের নিঃসঙ্গ পথিক – গোপাল ঘোষ

গোপাল ঘোষ নামক একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন বাঙালি সেকথা কবেই ভুলে গেছে। বিস্মৃতবাঙালীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য হাতে কলম তুলে নিলেন দেবকুমার সোম।

১৯৪০ দশক এই উপমহাদেশের পক্ষে সবদিক থেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও যুদ্ধের সার্বিক প্রভাব থেকে ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন ছিল না। তার ওপর বিয়াল্লিশে বাংলার দুর্ভিক্ষ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশে দেশভাগ আর আটচল্লিশে পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত যুদ্ধ। পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনা। এর মধ্যে রাজনীতিতে গান্ধীযুগ গিয়ে নেহেরু যুগ এসেছে। সাতচল্লিশ সাল অবধি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন পূর্ণচন্দ্র যোশী। মূলত তাঁর ও সোমনাথ লাহিড়ীর সমর্থনে *ফ্যাসিস্টবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ* প্রতিষ্ঠিত হলে একদিকে যেমন গণনাট্য সংঘ তৈরি হলো, অন্যদিকে সাহিত্য কিংবা চিত্রশিল্পে এলো নতুন এক তরঙ্গ। ১৯৩০ এর সূচনা সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথকে যেমন সাহিত্যে অস্বীকার করা হচ্ছিল, ঠিক তেমনই আবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রশিল্পের মধ্যে দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ কিংবা ই.বি. হ্যাভেলের নব্যবঙ্গ ঘরানার বিপ্রতীপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তখনকার চলতি হাওয়ার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এমন সরাৎসারের পেছনে হয়তো 'জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি'-র প্রতিস্পর্ধার ইতিহাস কাজ করেছিল। মোটের ওপর রবীন্দ্রনাথের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়েই চিত্রশিল্পে তখনই দুটো ভিন্ন ধারার জন্ম হয়। যার একদিকে চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোর, জয়নুল আবেদিন কিংবা দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রগতিশীল রাজনৈতিক শিল্পী। অন্যদিকে ছিল ইউরোপীয় আঙ্গিক আর দেশীয় ঘরানার সংমিশ্রণে তৈরি হওয়া 'ক্যালকাটা গ্রুপ'। অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ, মানুষসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, জাতিদাঙ্গা, দেশভাগ এর মধ্যে দিয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে যে বিপুল আলোড়ন ওঠে, সেই আলোড়ন আমাদের দেশীয় চিত্ররচনাকে তিনটে ভাগে ভাগ করে দেয়। নব্যবঙ্গীয় ধারার মূল শাখা থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে অপর দুটো শাখা পুষ্ট হয়েছিল সেদিন। আমাদের স্মরণে আছে চিত্তপ্রসাদ শান্তিনিকেতনে

নন্দলালের কাছেই ছবি আঁকা শিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তিনি অভিমানে যোশীর সহযোদ্ধা হন। তাঁর অনুপ্রেরণাই কাজ করে সোমনাথ হোরের মধ্যে। তেমনই যারা 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, তাঁদের মধ্যে অনেকেই নন্দলাল, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কিংবা দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছাত্র। যেমন গোপাল ঘোষ। এই গ্রুপে পরের দিকে যোগ দেন রামকিংকর। যিনি স্বয়ং শান্তিনিকেতনে ছিলেন নন্দলালের প্রথম পর্যায়ের ছাত্র। অবশ্য ১৯৪০ দশকের সব প্রতিভাই যে প্রগতিশীল কিংবা 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, তা নয়। বিনোদবিহারী, হীরালাল দুগার অথবা যামিনী রায় নববঙ্গ ধারাকেই পুষ্ট করেছেন।

গোপাল ঘোষের চিত্ররচনা সম্পর্কে কথা শুরুর আগে এত দীর্ঘ একটা মুখবন্ধ দিতে হলো, শুধু এটুকুই বোঝাতে যে নিসর্গ চিত্র যেমন এঁকেছেন বিনোদবিহারী বা হীরালাল দুগার, গোপাল ঘোষও তেমনই আজীবন নিসর্গ চিত্র এঁকেই স্থিরতা পেয়েছেন। এঁরা সকলেই ভাবধারায় অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল অনুসারী হলেও সৃজন দর্শনে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর। ফলে আমরা যখন নিসর্গ শিল্পী হিসেবে একই বন্ধনীর মধ্যে এঁদের আনি, তখন স্বভাবতই ভ্রম থেকে যায়। যেমন ধ্রুপদী ব্যাটসম্যান হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের স্কোয়ার কাট আর বিশ্বনাথের স্কোয়ার কাটে পার্থক্য রয়েছে। ঠিক তেমনই গোপাল ঘোষের নিসর্গ চিত্র রচনার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের নিসর্গ চিত্র রচনার আঙ্গিকগত প্রভেদ প্রচুর। এই প্রভেদ আরও গভীরে অনুভবের জন্য আমাদের গোপাল ঘোষের জীবন বৃত্তান্ত একটু জেনে নিতে হবে।

যদিও গোপাল ঘোষের পৈতৃক আবাস উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে। অথচ, শৈশব থেকে তরুণ বয়স অবধি তিনি ছিলেন বাংলা ছাড়া। তাঁর জন্ম ১৯১৩ সালে। গোপাল ঘোষের বাবা ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ছিলেন উঁচু পদের আর্মি অফিসার। তখন তিনি সিমলায় অবস্থান করছেন। গোপালের প্রথম শৈশব সিমলায় কেটেছে। পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা ব্রিটিশরাজের অত্যন্ত প্রিয় এই শৈলশহরে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের অভাব ছিল না। পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে শেষমেশ নীল-পাহাড়-মেঘে দৃষ্টি মিশে যায়। বরফ শিখরে দিনের প্রথম সূর্যের আলোর নম্র উন্মোচন কীভাবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক আকুতিতে ভরে যায়। সিমলায় শৈশবের চোখ ফোটার সময় সে সব তাঁর চেতনায় অনুপ্রবেশ করে। বাবার সামাজিক ক্ষমতায় তিনি স্থানীয় এক নামী ইংরাজি স্কুলে ভর্তি হন। গোপাল ঘোষ ছেলেবেলায় 'সুবোধ গোপাল' ছিলেন না মোটেও। বরং বেশিমাত্রায় ছিলেন ডানপিটে। স্বদেশি আন্দোলনের সময় একদিন তিনি তাঁর কয়েকজন ছাত্রবন্ধুর সঙ্গে মিলে স্কুলের ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ আসে।

পুলিশের বুলেট তাঁর ডান হাতে লাগে। এরপর ক্ষেত্রমোহন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বেনারসে বাস শুরু করলে, গোপাল পুরোনো এই শহরের অলি-গলি ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকা চর্চা করতে থাকেন। কলেজের পড়াশুনো বেশি এগোল না। ফলে ক্ষেত্রমোহন তাঁকে জয়পুরের 'মহারাজা স্কুল অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট'-এ ভর্তি করে দেন। জয়পুরের আর্ট কলেজে তখন অধ্যক্ষ ছিলেন শৈলেন দে। তাঁর কাছেই তিনি প্রথম শিখলেন নব্যবঙ্গ ধারার শিল্প। তখনই নব্যবঙ্গ ধারার প্রতি তাঁর মধ্যে বিদ্রোহ কাজ করতে শুরু করে। কারণ, নব্যবঙ্গ ধারায় ন্যুড স্টাডি-র চল ছিলনা। গোপাল ঘোষ তখন পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা সম্পর্কে বিভিন্ন বই দেখে অনুভব করলেন, বিদেশি শিল্পীদের মতো ছবিতে দক্ষতা আনতে হলে হিউম্যান স্টাডি কিংবা ন্যুড স্টাডির প্রয়োজন। ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকরদের মধ্যে এই প্রবণতা গভীরভাবে লক্ষ্য করেন তিনি। আর খুব শিঘ্রই নব্যবঙ্গীয় ধারার পাশাপাশি ইমপ্রেশনিস্টদের প্রতিও তিনি ঝুঁকলেন। তখন দেশে ন্যুড স্টাডির শিক্ষা দেওয়া হতো কেবল চেন্নাইয়ের গভর্মেন্ট স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড ক্রাফস-এ। তিন বছরের অ্যাডভান্স কোর্সে গোপাল ঘোষ তাই চেন্নাই পড়তে গেলেন। আর এখানেই শিক্ষক হিসেবে তিনি পেলেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে। স্নাতক হওয়ার পরে দেবীপ্রসাদের উপদেশে রেখার ড্রয়িং গভীর অনুশীলনের জন্য দেশ দেখতে বের হলেন। ক্লাসরুমের বাইরে বের হয়ে তিনি যেমন আরও গভীরভাবে পরাধীন দেশটাকে দেখতে পেলেন, ঠিক তেমনই রেখায় তাঁর দক্ষতাকে উৎকর্ষ সীমার বাইরে নিয়ে ফেললেন। জীবনভর গোপাল ঘোষ অজস্র স্কেচ করেছেন। তার ওপর কোন রঙ চাপাননি। কোন কোন নিসর্গ চিত্রকর কেবল রঙ নিয়ে খেলা করেন। জলরঙ কিংবা প্যাস্টেল বা কালি-কলম। কিন্তু গোপাল ঘোষ একজন আন্তর্জাতিক মানের নিসর্গ শিল্পী হয়েও রঙ কিংবা প্রকরণ নিয়ে নয়, রেখা নিয়ে সময় কাটিয়ে গেছেন। সামান্য কাগজ আর কলমের সাহচর্যে তিনি দুরন্ত সব রেখার সৃষ্টি করে গেছেন। আর এইভাবে স্টিল ছবি, হিউম্যান ফিগার, বা জন্তু-জানোয়ার বা ফুলের ছবি আঁকতে গিয়ে সাদা কাগজে তিনি রেখার যে বিন্যাস রেখে গেছেন, তা কেবল কাব্যিক নয়। অভ্রান্ত। ফলে তাঁর এই রেখার মধ্যে ক্যালিগ্রাফির টান দর্শকের নজর এড়ায় না। এভাবে ১৯৩৮ সালে যখন তিনি পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে এলেন, তখন দক্ষতায় পূর্ণ এক নতুন প্রতিভা হিসেবেই তাঁকে চিনতে সময় নেয়নি সমকালীন শিল্পী সমাজ। যদিও তখন তাঁর মধ্যে আঙ্গিক নিয়ে ছিল তীব্র টানা-পোড়েন। কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করবেন? কোন উপায়ে নিজের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে কাগজ কিংবা ক্যানভাসে? তাই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। এরই মধ্যে সাময়িক পত্র-পত্রিকায় অলংকরণের কাজ করেছেন। সমমনস্ক শিল্পীদের সঙ্গে ছবির প্রদর্শনীতে অংশ

নিয়েছেন। আর শেষমেশ প্রদোষ দাশগুপ্তদের সঙ্গে 'ক্যালকাটা গ্রুপ' তৈরি করেছিলেন। যে গ্রুপ এদেশের চিত্র-আন্দোলনের ইতিহাসের অন্যতম সফল প্রচেষ্টা।

'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এর সঙ্গে যারা সংপৃক্ত ছিলেন, তাঁরা যেমন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে এসেছিলেন, তেমনই তাঁদের শিক্ষাও একই পদ্ধতিতে হয়নি। ফলে গ্রুপ সদস্য হিসেবে একে অন্যের কাজের প্রশংসা কিংবা সমালোচনা করলেও কেউ কারোর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। কিন্তু নিসর্গ চিত্র রচনার যে পরম্পরা শুরু হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের হাত ধরে, যে ধারা এখনও সমান ক্রিয়াশীল, সেখানে গোপাল ঘোষের অবস্থান কোথায়? আমরা কি তাঁকে একজন নিসর্গ চিত্রশিল্পী হিসেবেই আজ মান্যতা দেব? আমরা কী তাঁর অন্যান্য সফল কাজগুলোর কোন আলোচনা করবো না? শতবর্ষ পেরিয়ে যাওয়া একজন প্রায় কিংবদন্তী বাঙালি শিল্পীকে কী চোখে দেখবে ভাবিকাল?

এই আলোচনায় আসতে গিয়ে আমরা প্রথমেই বিস্মিত হই দেখে যে, শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দির মধ্যে না থেকেও, বিদ্রোহী 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এর একজন সক্রিয় সদস্য হয়েও গোপাল ঘোষ আজীবন প্রায় জলরঙের কাজই করে গেলেন। কিছু প্যাস্টেল কাজ থাকলেও, তাঁর বড়ো কাজ সবই কাগজের ওপর জলরঙ। ভাবলে বেশ কৌতুহল জাগে। গোপাল ঘোষ ইমপ্রেশনিস্টদের টেকনিককে আত্মস্থ করেছেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনী ধারার মতো জলরঙেই ঘটেছে তাঁর প্রকাশ। তখন জলরঙের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে সহজলভ্য ছিল সত্যি, যুদ্ধের বাজারে বিদেশ থেকে ভালো মানের তেলরঙ আসতো না। এলেও চোর-বাজারে যারা রাজ-রাজাদের প্রতিকৃতি আঁকতে দড়, তাঁদের কাছেই বিকোত। সে সমস্যা গোবর্ধন আশ, রথীন মিত্র কিংবা মৈত্রদের ছিলনা? বিলক্ষণ ছিল। তবুও গোপাল ঘোষ কেন জলরঙেই স্থিত ছিলেন? কারণ তাঁর সিদ্ধি জলরঙে। আগেই আলোচনা হয়েছে গোপাল ঘোষ রঙ নিয়ে নয়, বরং ছবির রেখা নিয়েই মগ্ন ছিলেন। ফলে কালির ওপরই ছিল তাঁর টান। এই টান তাঁর ছবিকে অনেকাংশে ক্যালিগ্রাফিক করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। জলরঙে অসুবিধা যেমন বিস্তর, সুবিধাও আছে। রেখার টান সে তির্যক বা সরল যাই হোক, খুব কাব্যিক হয়। তুলি কিংবা কলমের একটা মোটা বা সুক্ষ্ম টানে ছবির প্রেক্ষাপট কেমন পাল্টে যায়। ব্যাপারটা স্পষ্ট ধরা পড়ে রামকিংকরের জলরঙের ছবিতে। কিষাণ-কিষাণীরা জমিতে কাজ করছে। কিংবা একজন চাষা তার বলদকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এমন সব ছবিতে রামকিংকর খুব ডিটেইলিং-এ যাননি। বরং একটা-দুটো

তুলির খোঁচায় জলরঙের প্রেক্ষাপট থেকে টেনে বের করে এনেছেন ছবির বিষয়। গোপাল ঘোষেরও রেখার প্রতি তীব্র টান বা অবশেসন তাঁর ছবিকে বারবার জলরঙের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

গোপাল ঘোষ ইমপ্রেশনিস্টদের ছবি এবং টেকনিকে প্রভাবিত ছিলেন। বিশেষত সেজান্ কিংবা মোনের ছবির। সেটা তাঁর স্টিল ছবি বা নিসর্গ চিত্র দেখলেই টের পাওয়া যায়। তাঁর ছবিগুলো রচিত দর্শকের দৃষ্টিতে। তিনি নিসর্গ আঁকছেন যেন এমনভাবে, কেউ নিরাপদ দূর থেকে পাখির দৃষ্টিতে নিসর্গ দেখছে। অনেকক্ষণ ধরে দেখছে। ফলে দর্শকের চোখের ওপর যেটা ফুটে উঠছে, সেটা ঠিক বাস্তবধর্মী নিসর্গ দৃশ্য নয়। বরং একটা অনুভূতি। একটা আবেশ বের হয়ে আসছে। তাঁর সমসাময়িক যাঁরা নিসর্গ চিত্র এঁকেছেন, তাঁদের থেকে গোপাল ঘোষের পার্থক্য এই, তিনি বস্তুর মধ্যে স্থিত না হয়ে অবতল থেকে বুঝতে চেয়েছেন প্রকৃতির ভাষা। শৈশব থেকেই তিনি বাহিরমুখো। অফুরন্ত প্রকৃতির মধ্যেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। ফলে প্রকৃতির নির্যাসকে মননে স্থাপন করতে তাঁর টেকনিক হয়ে উঠেছে ছবি নয়, ছবির অনুভূতি। এ প্রসঙ্গ আমরা তাঁরই সমকালীন আর এক বিস্ময়কর প্রতিভার কথা বলতে চাই। তিনি হলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। বিনোদবিহারী দৃষ্টিশক্তির ক্রম ক্ষয়িষ্ণুতার মধ্যে অন্তর্জগতের ভেতরে রঙের চেতনা নিয়ে, আলোর চেতনা নিয়ে খেলা করেছেন। গোপাল ঘোষের মতো তাঁরও ছবিতে ক্যালিগ্রাফিক মেজাজ দেখা যায়। কিন্তু বিনোদবিহারীর ছবিতে আলোর যে ঝলক, সেই ঝলক অনুপস্থিত গোপাল ঘোষের ছবিতে। মনে হয় ভ্রাম্যমান জীবনে গোপাল ঘোষ আলোর এত রকমফের দেখেছেন যে, আলো নিয়ে তাঁর কোন কারুকার্য ছিল না। মনে হয় আলো নয়, আলোর উদ্ভাস নিয়েই ছিল তাঁর যাবতীয় মুদ্রাদোষ।

গোপাল ঘোষের সময় থেকে আমরা নয় নয় করে আজ ৭০/৮০ বছর পার হয়ে এসেছি। এখন আর রঙের শ্রেণী বিভাজন নেই। তবুও ছাত্র কিংবা চিত্রশিল্পীরা নিসর্গ চিত্র আঁকার সময় জলরঙ তুলে নেন। কারণ জলরঙের তরলতায় খেলা করে আলোর রকমফের। দেশভাগের আগু-পিছু এই শহরে নিসর্গ চিত্র রচনায় গোপাল ঘোষ সেই আলোর ঠিকানা পাননি। ফলে আজকের ফোটোগ্রাফিক নিসর্গ চিত্রের চেয়ে অনেকবেশি অবাস্তব তাঁর আঁকা ছবিগুলো। যেগুলো দর্শক আর শিল্পীর চেতনায়। মননে।

গোপাল ঘোষ আজীবন একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন। কোনো ফোটোগ্রাফার নন।

চিত্র পরিচিতি : গোপাল ঘোষ ও তাঁর সৃষ্টি।